ভূমিকা

॥ ১ ॥

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র যে ভূমিকা লিখেছেন তাতে লেখিকার শিল্প-কুশলতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে। সেই আলোচনা থেকে পাঠক-পাঠিকারা লেখিকার সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্যই অবগত হবেন। অবশ্য একথা ঠিক, পিঠার মিষ্টত্ব যেমন স্বাদে, তেমনি কথা-সাহিত্যের রসাস্বাদও পাঠে। এক ডজন সমালোচনা ও বিশ্লেষণ পড়ে গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে যে ধারণা জন্মায়, তার চেয়ে অনেক বেশী সাহিত্যবোধ জন্মে—যদি পাঠক নিজের গরজেই গল্প-উপন্যাস পড়ে ফেলেন। সাধারণ পাঠক আদার ব্যাপারী; তার সমালোচনারূপ জাহাজের খোঁজে দরকার-ই বা কী? সুতরাং শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর ঔপন্যাসিক প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ জানতে গেলে তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস পড়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। সেই জন্য পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ করব, তাঁরা নিজেরাই লেখিকার গল্প-উপন্যাস পড়ে তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত তৈরি করুন। তবু ভূমিকায় দু-চার কথা বলতে চাই। অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে পাণ্ডিত্য প্রকাশ বা গুরুমশাইগিরির জন্য নয়। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর বই পড়ে যে আনন্দ ভোগ করি, পাঠকদের মনে তারই যৎকিঞ্চিৎ বণ্টন করে দেওয়ার জন্যই এখানে এই প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলতে হল।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় আমার বাল্য-কৈশোর থেকে। অবশ্য সে পরিচয় চাক্ষুষ নয়, তাঁর লেখার মারফতেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়েছিল। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন ছেলেদের মাসিকপত্রে তাঁর লেখা দু-একটি গল্প পড়ে তাঁর প্রতি প্রথম কৌতূহলী হই। গল্পগুলি সবই কৌতুকরসের। চমকপ্রদ চাঁছাছোলা ভাষায় ছেলেদের মনের উপযোগী করে অসঙ্গতিজনিত হাস্যকৌতুক পরিবেশন করা খুবই দুরূহ। কিন্তু লেখিকার সেই গল্পগুলিতে কৌতুকের যে ঝিকিমিকি ফুটে উঠেছিল, তার অন্তরালে একটা পুরুষালি ঢং আমাকে বেশী মুগ্ধ করেছিল। গল্পটার নাম যতদূর মনে পড়ছে—'একটুর জন্যে'। এই ঋজু ধরণের কৌতুকরস লীলা মজুমদারের ছোটদের গল্পে কিছু কিছু পেতাম। মাঝে মাঝে সন্দেহ হত, আশাপূর্ণা দেবী যথার্থ কোন মহিলা-লেখিকা, না কোন পুরুষ-লেখকের ছদ্মবেশ? কেন না, এদেশে অনিলা দেবী, নীহারিকা দেবী, অমলা দেবী—অনেক 'দেবী'ই আদৌ দেবী নন, নিতান্ত পুরুষজাতীয় জীব—তা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে জেনেছিলাম। আমাদের বাংলা সাহিত্যে মহিলা-লেখিকারা প্রায় অধিকাংশ স্থলেই হয় গীতিকবিতা, আর না হয় সরল, স্নিগ্ধ, করুণ, কোমল গল্প লিখতেই অভ্যস্ত। আমাদের কেমন একটা ধারণা জন্মে গেছে, লেখিকা হলেই এই ঘরোয়া ধরণের অতিপরিচিত

জীবনচিত্র তাঁর লেখনীমূলে আবির্ভূত হবে। তার ব্যতিক্রম ঘটলে সন্দেহ হয়—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'—কোন্ দেবতাকে হবিঃ দান করব ?

এক সময়ে বাংলাদেশের কোন কোন কবিযশঃপ্রার্থী পুরুষ-লেখক স্ত্রীলোকের ছদ্মনামের আড়ালে কাব্য-কবিতা লিখতেন (যেমন—'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র লেখক)। একালে নীহারিকা দেবীর ছদ্মনামের আড়ালে বসে কোনো-এক পুরুষ-লেখক বিখ্যাত মাসিকপত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তার অনেক আগে উনিশ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকের দিকে ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদপত্রে ('সংবাদ প্রভাকর') স্ত্রীলোকের নামে গুটিকতক পদ্য মুদ্রিত হয়েছিল, যাকে কোনক্রমেই কবিতা বলা যায় না।. সেগুলি যথার্থই কোন নারীর রচনা কিনা তাতে সন্দেহ জাগে। অতঃপর বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দুসমাজে স্ত্রীশিক্ষা যৎকিঞ্চিৎ অগ্রসর হল। মিশনারীদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল "জেনানা মিশন"। ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্রের 'নববিধানের' দ্বারাও বাঙালী হিন্দুসমাজে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা অগ্রসর হল। উনিশ শতকের অষ্টম দশকের দিকে বাঙালী কুলবধূরা কেউ কেউ ভীরু কুণ্ঠিত চরণে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী এবং তাঁর পরে অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য স্থান করে নিলেন ; অবশ্য এঁদের কারও কারও রচনায় ইচ্ছাকৃতভাবে পুরুষালি ঢংটা এত প্রকট হয়ে উঠেছে যে, এঁদের নারী স্বভাবের যথার্থ স্বরূপ অনেক সময়ে বাধা পেয়েছে। সে যাই হোক, বিশ শতকের গোড়ার দিকে বোঝা গেল যে, সাহিত্য, বিশেষতঃ কথাসাহিত্যে ও গীতিকবিতায় লেখিকারা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দভাবে পদচারণা করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের মহিলা সাহিত্যিকেরা এখনও হৃদয়ারণ্যের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করছেন, পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে মননের ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করতে যেন কিছু দ্বিধান্বিত।

॥ ২ ॥

একালের উপন্যাসের ক্ষেত্রে পুরুষ ঔপন্যাসিকের মতো সর্বপ্রথম খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন অনুরূপা দেবী। তাঁর উপন্যাসে কাহিনীগত ঘনত্ব ও চরিত্রগত বৈচিত্র্য বড়োই গতানুগতিক। এর কারণ, জীবন-সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলো বিশেষ ধরণের ধরাবাঁধা চিন্তা আছে, যা প্রায়ই কৃত্রিম নীতিমার্গকে সমাজজীবন পরিমাপের একমাত্র গজকাঠি বলে মনে করে। বঙ্কিমী-সূর্যোত্তাপে আতপ্ত সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী উপন্যাসে যাদের বরমাল্য দিয়েছেন, তারা স্বতই বৃহৎ, মহৎ, আদর্শবান্ এবং আত্মত্যাগের দ্বারা সুমহান ; কিন্তু জীবনের গলিঘুঁজিতে যে বক্রতা রয়েছে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে নিত্যই যে বিষাক্ত আবিলতা ফেনিয়ে উঠছে, সেই সমস্ত কঠোর কর্কশ আদিম বর্বরতাকে তিনি সশঙ্কচিত্তে পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং যা নেই, কিন্তু হওয়া উচিত, যার দ্বারা ধূলিম্লান

জীবনকে জ্যোতির্ময় লোকে তুলে ধরা যায়—অনুরূপা দেবী তাঁর অধিকাংশ চরিত্রকে সেই সমস্ত আদর্শায়িত কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। অবশ্য তার মূলটা মৃত্তিকাতলেই প্রোথিত। কিন্তু পঙ্কজকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি পঙ্ককুণ্ড ঘুলিয়ে তুলবার প্রয়োজন বোধ করেননি। বলাই বাহুল্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতী'-গোষ্ঠী ও 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর প্রবল প্রাধান্যের দিনেও অনুরূপা দেবীর ভক্ত পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা যথেষ্টই ছিল। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আমরা যতই প্রগতি, আধুনিকতা, রুশ-দেশীয় সমাজবাদ এবং ফ্রয়েড ও উত্তর-ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের গরম মশলা মিশিয়ে বাঙালী উপন্যাস-পাঠককে উত্তেজিত করতে চাই না কেন, যতই নিষিদ্ধ পল্লীর গণ-নায়িকাদের কথা লিখি না কেন, বাংলার পুরাতন সমাজব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবন, যা বঙ্কিমযুগকে লালন-পালন করেছিল, তা বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেও প্রায় অটুট ছিল—অন্ততঃ গ্রামবাংলায়।

বাংলাদেশে তো মাত্র একটাই শহর, যার নাম কলকাতা। অবিভক্ত বাংলার পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে দু-চারটি ছোটখাট শহর থাকলেও যথার্থ নাগরিকতা-বোধ কলকাতাতেই গড়ে উঠেছে এবং এখনও সেই ধারাই বর্তমান। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ঢাকা শহরকে অতি-প্রাধান্য দেবার চেষ্টা হয়েছিল রাজনৈতিক অভিসন্ধিবশতঃ। কিন্তু বিপুল অর্থব্যয় সত্ত্বেও বিদেশী শাসন ঢাকাকে কলকাতার প্রতিদ্বন্দ্বী করে গড়ে তুলতে পারেনি—যদিও সেখানে স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মাধিকরণ, সভাসমিতি, খেলাধূলা, নৃত্যগীত-অভিনয়—সবই ছিল। যাকে urbanity বলে, অর্থাৎ মনের সেই ঈষৎ কৃত্রিম বক্রতা, যার সঙ্গে আত্মসচেতন যৌক্তিকতা অনুস্যূত হয়ে থাকে—কলকাতাই হচ্ছে তার প্রাণকেন্দ্র। অবশ্য আমরা রক্তস্নাত আধুনিক ঢাকা নগরীর কথা বলছি না, আমাদের দৃষ্টি ইংরেজ আমলের দিকেই প্রসারিত।

একালে একদিকে কলকাতা হয়ে উঠল রম্যা নগরী, সারা ভারতের প্রাণকেন্দ্র, ভাবগত ভূকম্পনের epicentre; অপরদিকে অবহেলা, অনাদর, রোগে-শোকে বাংলার, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার গ্রামজীবন দুঃসহ অভিশাপে মৃতবৎ হয়ে পড়ল। শরৎচন্দ্র আবেগবহুল বর্ণনার রসে গ্রামবাংলার এই করুণ চিত্রটি বড়ো বেদনাময় করে এঁকেছেন। এই গ্রাম্য জীবন ও সমাজের বুকে মানুষের দুঃখবেদনার রেখাচিত্রটি তাঁকে কতকগুলি উৎকট প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিল; এই সমস্ত অনাচার-অত্যাচারের জন্য দায়ী হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী সমাজ। শরৎচন্দ্র সেই অশরীরী দানবটাকে যেন অগ্নিবাণে বিদ্ধ করতে চাইলেন। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-শাসিত সমাজ তখন আর ছিল না, ছিল শুধু তার কঙ্কালমূর্তি। তারই ওপর শরৎচন্দ্র আঘাত হানলেন। অবশ্য সমাজ সংস্কার বা সমাজের পুনর্গঠন—এ-সমস্ত শরৎচন্দ্রের মূল লক্ষ্য ছিল না। সাহিত্যের দ্বারা সমাজসেবা বা সমাজের পুনর্গঠন, এ-সব ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না। সাহিত্যের এই

ধরণের মাপাজোখা উদ্দেশ্যমূলকতায় তাঁর আন্তরিক কোনও আকর্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। মানুষের ব্যর্থতা ও বেদনাকেই তিনি চোখের জলে আর্দ্র করে পাঠকের দরবারে পেশ করেছেন। অনুরূপা দেবী ভিন্ন পথ ধরেছিলেন। বিকৃতিকে অস্বাভাবিক ও ক্ষণস্থায়ী মনে ক'রে পুরাতন নীতি-সংহিতাশ্রয়ী হিন্দুর পারিবারিক আদর্শকে তিনি ব্যক্তির জীবনে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। এর ফলে শরৎচন্দ্রের পাঁচাপাঁচি কাহিনীগুলিও অনুভূতি-প্রবণ ও আবেগব্যাকুল পাঠককে করুণার্দ্র কান্নায় ভরিয়ে তোলে। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে গুরুভার চরিত্র ও ঘোরালো কাহিনীতে ঠিক সেই নিরাবরণ প্রাণেব অকুণ্ঠিত প্রকাশটি যেন বাধা পায়। তিনি তাঁর উপন্যাসে মানুষের অসংযত প্রবৃত্তি-তুরঙ্গের মুখে বল্‌গা জুড়ে দিয়ে তাকে বশে আনতে চেয়েছেন। এই ধরণের মনোভাব তিন-চার দশক আগে গ্রামীণ সমাজে যথেষ্ট ছিল, নাগরিক শিক্ষিত সমাজেও নীতিঘেঁষা সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে অনেকের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল। গল্প-উপন্যাস শুধু ভালো লাগার জন্যই নয়, চরিত্র গঠনেব কাজেও লাগে—এই ধরণের সৎ ও সাধুবিশ্বাস কিছুকাল আগেও বাঙালী পাঠক সমাজে যথেষ্ট ছিল, এখনও কি তা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে? রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস একটি বিশাল জ্যোতির্ময় বিচিত্র শিল্পকর্ম হলেও অর্ধ শতাব্দী পূর্বে তাব পাঠকসংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ যুধিষ্ঠিরের রথের মতো তাঁর উপন্যাসের ঘটনা, কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ, সংলাপ—সবই যেন মাটির কিছু ওপর দিয়ে চলে, কর্ণের রথের মতো ভূমিকে বিদীর্ণ করে গভীব ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করে না।

॥ ৩ ॥

বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবীর স্থান চিন্তা কবতে গিয়েই মনে হল, তাঁর লেখা আমার অত্যন্ত প্রিয এবং বাংলাদেশের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার মতো আমিও তাঁর বই পেলে একাসনেই পড়ে ফেলবার তাগিদ অনুভব করি। বক্ষ্যমাণ দ্বিতীয় খণ্ডে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র পূর্বার্ধ এবং কয়েকটি পূর্ব-প্রকাশিত গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। উপন্যাসটি লেখিকার এ-যাবৎ-কালের মধ্যে রচিত যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং একালের অন্যান্য খ্যাতিমান লেখকের উপন্যাসের মধ্যেও যে একক প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে উপন্যাসখানি সর্বশ্রেণীর পাঠক-সমাজে অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছে এবং রসিক সমালোচকেরা বলতে শুরু করেছেন, বাংলা সাহিত্যে এ উপন্যাস ভবিষ্যতেও এমনই জনবল্লভ হয়ে থাকবে। আমার মতে এটি তাঁর সবচেয়ে পরিণত এবং পরিপক্ক রচনা। কাহিনী-গ্রন্থণ, চরিত্রবিন্যাস ও মনোবিশ্লেষণ, পরিবেশ রচনা এবং জীবন সম্বন্ধে বলিষ্ঠ, আশাবাদী ও বিদ্রোহী ইঙ্গিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র পূর্বার্ধকে স্মরণীয় করে রাখবে।

রোমাঁ রোলাঁ একটি নবজাত বালককে নিয়ে 'জাঁ ক্রিস্তফ' শুরু করেছিলেন, বিভূতি-ভূষণও বালক অপুকে ঘটনার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে 'পথের পাঁচালী'তে সরল গ্রাম্য জীবনের ছবি এঁকেছেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রূপকথার রহস্য, সাধারণ মানুষের অসাধারণ রোমান্স—যা উদ্বেলিত করে না, ক্ষুব্ধ করে না, বিষণ্ণ করে না, প্রতিদিনের জীবনের ওপর একটি শ্যামল কল্পনার আস্তরণ বিছিয়ে দেয়। আশাপূর্ণা দেবী আট বছর বয়সী পাকা গিন্নী সত্যবতীকে পল্লীবাংলার একান্নবর্তী পরিবারের মাঝখানে এনে কাহিনী আরম্ভ করেছেন। কিন্তু কাহিনীর মূল আরও দূরে সম্প্রসারিত।

তখন বাংলাদেশের মুসলমান শাসনে যবনিকা পড়ছে। রামকালী চাটুজ্যে অল্প বয়সে রাগ করে বাড়ী ছেড়ে মুকুন্দদাবাদ উপনীত হন এবং এক কবিরাজের কাছে আয়ুর্বেদ ভালো করে আয়ত্ত করে যৌবনে দেশে ফিরে আসেন। ব্রাহ্মণের ছেলের ভিষগ্‌বৃত্তি সেকালের সমাজ প্রথমটা মেনে নিতে না পারলেও কালে তিনি গ্রামসমাজে খ্যাতিমান কবিরাজরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁরই একটু বেশী বয়সের একমাত্র সন্তান কন্যা সত্যবতী। রামকালী প্রথম থেকে স্পষ্টবাদী, যা সত্য বলে মনে করেন তা জীবনে গ্রহণ করার অমিত শক্তি তাঁর আছে। গ্রাম্য সমাজের অসার ভর্ৎসনাকে লঘু করার দুঃসাহসও তাঁর যথেষ্ট। বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের তিনি কুলপতি।

ইতিহাসের সনতারিখ ধরলে মনে হবে, ঘটনার পটোত্তলন ঘটেছে উনিশ শতকের তিন-চার দশকের দিকে। তখন সমাজ ও পরিবারে এতটা ঘুণ ধরেনি। তখন পরিবার নামক বৃহৎ বটবৃক্ষ ছোটবড়ো সকলকেই আশ্রয় দিত, ছায়া দিত, বিধবাদের পুষত, অকর্মণ্য নিরুদ্যম পুরুষকেও গ্রহণ করত। সেই গ্রাম্য পরিবার নিত্যই হাস্যরহস্যে মুখর ছিল, কলহ-কলরবে অতি সহজেই মত্ত হয়ে উঠত। বৃদ্ধা বিধবা, বহু পুত্রের জননী ঘরণীগৃহিণী, উপার্জনক্ষম একজন এবং উপার্জনবিমুখ বহুজন—এই পরিবেশে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু। সেই বিশাল পরিবারের মানদণ্ড ধারণ করে আছেন রামকালী চাটুজ্যে। অন্যায়কে তিনি সহ্য করেন না, উচিত কথা বলতে সঙ্কুচিত হন না, রোগহর তিক্ততাকে গ্রহণ করাই তাঁর বৃত্তি। প্রয়োজনে পড়লে তিনি ছোটখাটো মানসিক দুর্বলতার ওপর উঠতে পারেন, অপরিণামদর্শী গুরুজনকেও রূঢ় কথা শোনানো তিনি কর্তব্য বলে মনে করেন। তাঁর চরিত্র খাপখোলা তরবারির মতো ঋজু ও শাণিত। যে-বয়সে এবং যে-যুগে তিনি বাড়ী ছেড়ে অকূলে ভেসেছিলেন এবং ভাগ্যক্রমে মুকুন্দদাবাদের বিখ্যাত কবিরাজ গোবিন্দ গুপ্তের সান্নিধ্যে এসে নিজেও প্রথিতযশা কবিরাজ হয়েছিলেন, সে বয়সে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এই যে প্রায় দেড় শতাব্দীর আগেকার একটি তরুণ যুবক, যিনি আচার ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন, বহুকালের পুরাতন রীতিনীতিকে ভেঙে চুরে বেরিয়ে যেতে পারেন, তার স্বাভাবিকতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, কোন কোন জাতকের জন্মলগ্নেই তার কপালে বোধ হয় বিধাতাপুরুষ অভাবনীয়ত্বের

জয়টিকা দিয়ে জগৎ-সংসার ছেড়ে দেন। সে তখন আর পাঁচজনের মতো হতে চায় না, সকলকে ছাড়িয়ে অন্যভাবে বেড়ে উঠতে চায়। তা নইলে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যখন গ্রাম তো দূরের কথা, কলকাতা শহরই মধ্যযুগের অন্ধকার ভালো করে পার হয়নি, তখন বীরসিংহ নামে একটি ছোট গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা নামে একটি অগ্নিগর্ভ বালকের জন্ম হল কি করে? পুরাতন বাংলায় লালিত হয়ে পুরাতন সংস্কৃত বিদ্যা আয়ত্ত করে টুলো পণ্ডিত না হয়ে তিনি সংস্কারদ্রোহী মহাসত্ত্বাবান বিশাল পুরুষ হলেনই বা কি করে? কারো কারো মধ্যে এই ধরণের অসাধারণত্ব আসে। কুলপ্রথা, পৈতৃক ঋকথ, পরিবেশ, না প্রতিভা—কোন্‌টি মানুষকে অধিকতর বেগ দান করে তা বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাজেই রামকালীর মধ্যে যে বিদ্রোহ ও অন্যায়কে অস্বীকার করার মতো মানসিক বলিষ্ঠতা রয়েছে—তা অদ্ভুত হলেও অস্বাভাবিক নয়। লেখিকা আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতকে অস্বীকার করেছেন, এই চরিত্র প্রসঙ্গে এ কথা বলাও ঠিক হবে না।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র প্রথম দিকের কেন্দ্রপুরুষ রামকালী চাটুজ্যে, দ্বিতীয়াংশে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর কন্যা সত্যবতী। উত্তরার্ধে (যা এইখণ্ডে সঙ্কলিত হয়নি) সত্যবতীরই প্রাধান্য। খুড়ি, জেঠি, পিসী, ঠানদিদি শাসিত একান্নবর্তী পরিবারের বৃহৎ পরিবেশে সত্যবতীর বাল্য-কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। সেই পরিবারের অসংখ্য চরিত্রের সে একটি। কিন্তু অসংখ্যের মধ্যেও তার একটি বিশেষ সংখ্যা আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে সে কয়েকটি বিশেষ গুণ আয়ত্ত করেছে। তা হ'ল উচিতবোধে স্পষ্ট কথা বলার স্বাভাবিক সাহস এবং যে-কোনও কাজে অসীম আগ্রহ ও কৌতূহল।' আট বছর বয়স থেকেই বালিকাসুলভ খেলাধুলা ও সখা-সখীদের সাহচর্যে তার চরিত্রের এই দিকটি ফুটে উঠেছে। পিতা ও পুত্রীর চরিত্রগত এই সাদৃশ্যের জন্যই বালিকা সত্যবতী পিতার দু-একটি অযৌক্তিক আচরণের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে পিছপাও হয় না। তার কথাবার্তায় বালিকা-সুলভ ছেলেমানুষীর সঙ্গে হয়তো একটু বেশী গিন্নীপনা আছে যাকে, অকালপক্কতা বলা যেতে পারে। কিন্তু তার বাক্‌ভঙ্গিমার বক্রতায় যে কৌতুক ঝরে পড়েছে, তাতেই পাকা পাকা কথার অশোভনতা অনেকটা ঢাকা পড়ে গেছে। সেই বালিকা সত্যবতীর বিবাহ হল সেই বয়সে, যে বয়সে এখনকার মেয়েরা পুতুল খেলে। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হল। শ্বশুর, শাশুড়ী এবং স্বামী নবকুমারের প্রতি তার ব্যবহার ও আচারে-আচরণে পাঠকের মনে খটকা লাগলে বুঝতে হবে, তাকে লেখিকা নেড়ু বা পুণ্যির মতো করে আঁকতে চাননি।

বালিকা সত্যবতীর বড়ো ভয়-ডর নেই, রাত্রিতে বাগানে গিয়ে পেঁচার চোখ গুণতে তার অসীম উৎসাহ। কোনও বিষয়েই সে হার মানতে রাজী নয়। অন্যায় দেখলে তার বালিকা মন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, রসনা হয়ে ওঠে খরতর। এই দস্যি দামাল মেয়ের নিতান্ত বালিকা বয়সে বিয়ে হয়ে গেল, কারণ রামকালী কোন কোন দিক থেকে সমাজ ও পরিবারের

হিতকর পুরাতন পন্থাও অনুমোদন করেছেন। পুরুষের একাধিক বিবাহ তাঁর কাছে খুবই স্বাভাবিক। কন্যার আপদগ্রস্ত পিতাকে কন্যাদায় থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি বিবাহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। নিজের পুত্র থাকলে তিনি একই কাজ করতেন। একজন বিপন্ন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্র গৃহস্থের জাতি রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত সুখসুবিধাও তুচ্ছ করতে হয়, এই হচ্ছে তাঁর মোটামুটি পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা।

অতিশয় দৃঢ়ধরণের আদর্শবাদী হবার জন্য অনেক সময়ে রামকালীর মানবিক সত্তা কিছু ম্লান হয়ে গেছে এবং এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আদর্শবাদীরা মানবিক দুর্বলতার চেয়ে আদর্শকেই বড়ো বলে মানেন এবং প্রাণের স্পর্শ যতই ম্লান হয়ে আসে, ততোই তাঁরা আদর্শকে স্বধর্ম বলে আঁকড়ে ধরতে চান। একমাত্র জামাতা দারুণ ব্যাধিতে মরণাপন্ন হলেও তিনি জামাতার বাড়ী গিয়ে চিকিৎসা করতে পারলেন না, কারণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে নীতি-নিয়ম পালন করতে গিয়ে তিনি কন্যা জামাতার প্রতি মানবিক দুর্বলতা দমন করলেন। তাঁর চরিত্রে শুধু একটি ছিদ্র আছে। তা হল, নীতিধর্মে ও মানবধর্মে বিরোধ বাধলে তিনি কর্তব্যের খাতিরে স্বচ্ছন্দে মানবিক স্নেহ ভালোবাসার দাবি উপেক্ষা করতে পারতেন। এর ফলে তাঁর চরিত্রে মাঝে মাঝে এমন একটা অনমনীয়তা সঞ্চারিত হয়ে যাকে যাকে নির্মমতা বলে ভুল হতে পারে।

কন্যা সত্যবতী কিশোরী থেকে যুবতী এবং পরিশেষে সন্তানের জননী হল। সে পিতার মতো উচিত কথা, স্পষ্ট কথা, সত্য কথা বলতে পারে। প্রয়োজন হলে পিতার অযৌক্তিক কাজের সমালোচনা পিতার সামনেই করতে পারে। গুরুজনের মূঢ়তাকে ব্যঙ্গ করতে তার বাধে না। রাত বেড়ানো শ্বশুরকে সে শ্রদ্ধা করে না, এবং শ্বশুরের প্রতি অশ্রদ্ধা সে গোপনও করে না। যে প্রবীণ ব্রাহ্মণসন্তান রাত্রিতে ব্রাহ্মণেতর স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে থাকেন, তিনি শ্বশুর হলেও তাঁকে সে ঘৃণাই করে। দজ্জাল শাশুড়ীর নীচতাকে সে নির্মমভাবে বিদ্ধ করতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, তাঁর বর্বরতাকে সে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে। ব্যক্তিত্ব-বর্জিত স্বামীর ভীরুতাপূর্ণ ভালোমানুষীকে সে সদাসর্বদা খোঁচা দিয়ে তার মধ্যে শক্ত ভাব জাগাতে চায়। আবার সেই স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার রোগ নিরাময়ের জন্য সে অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দেয়। দেখা যাচ্ছে, হিন্দু নারীর স্বামীভক্তিরূপ একটা আইডিয়াকে সে শ্রদ্ধা করে, পালন করে। স্বামী তার ভক্তির যোগ্য হতে পারছে না বলেই তার ক্ষোভ।

পিতা রামকালীর সঙ্গে সত্যবতীর চরিত্রের দিক থেকে গভীর সাদৃশ্য থাকলেও একদিকে একটা বড়ো রকমের পার্থক্য আছে। সত্যবতী মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতাকে ঘৃণা করে না, স্নেহভালোবাসাকে কর্তব্যের বাটখারা দিয়ে মাপজোখ করে না। তাই তার মধ্যে মান-অভিমান প্রবল, কিন্তু অকারণে নয়। আভিজাত্যবোধ কিছুটা অহঙ্কারের ধার ঘেঁষে গেলেও ব্যক্তিগত মর্যাদা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন। তার দুঃসাহসের অন্ত নেই এবং সে দুঃসাহসের উৎস হচ্ছে কর্তব্যবোধ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয়। সেই প্রত্যয়ের

বশেই সে স্থির করল, এবার আর কলহকণ্টকিত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য জীবন নয়, গলিত পরিবেশ নয়, হাজার বছরের পুরাতন জীর্ণ সংস্কার নয়, এবার গন্তব্যস্থল হবে কল্লোলিনী কলকাতা, নতুন সভ্যতার নতুন রাজধানী। সেখানে গেলে, সন্তানদের আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা দিলে, তবে তারা মানুষ হবে, দশজনের একজন হবে। স্বামী নবকুমার বাল্যে-কৈশোরে জননীকে ভয় করত বাঘিনীর মতো, যৌবনে সত্যবতীকেও সেই একই ভীরুচকিতভাবে দেখত। সে হয়েছে স্ত্রীর ইচ্ছাপূরণের ছায়ামাত্র। অনিচ্ছা ও আশঙ্কা সত্ত্বেও সত্যবতীর ইচ্ছার কাছে তাকে নত হতে হয়, কলকাতায় আসবার সম্মতি দিতে হয়। ইংরেজী জানা নবকুমারের কলকাতার সরকারী অফিসে একটা মাঝারি ধরণের চাকুরিও জুটে যায়।

কলকাতায় যাত্রা করার পূর্বে সত্যবতী পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে এল। পুরাতন নানা স্নেহস্মৃতিজড়িত জীবনের অবসান, এবার নতুন জীবন—সামনে অকূল সমুদ্র, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। রামকালীর কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে এল। তার পিতৃগৃহেও পরিবেশ বদলাতে চলেছে, জননী আগেই গতায়ু। বৃদ্ধার দল চলে গেছেন, দু-একজন পারঘাটায় শেষযাত্রার জন্য অপেক্ষা করছেন। পিছনে পড়ে রইল এই পরিচিত অভ্যস্ত জীবন, সম্মুখে দুর্জ্ঞেয় রহস্যভরা কলকাতার জীবন। রামকালী ম্লানভাবে কন্যা-জামাতাকে বিদায় দিলেন। তিনিও জীবনযুদ্ধে শ্রান্ত ক্লান্ত, ভগ্নপক্ষ মৈনাকের মতো সমুদ্রতলশায়ী। কন্যা সত্যবতী তরুণ গরুড়ের মতো নতুন আকাশের সীমাসন্ধানী।

এইখানে লেখিকা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র পূর্বার্ধের যবনিকা টেনেছেন। অপরার্ধে নতুন খাতে সত্যবতীর জীবন যে বিচিত্র সম্ভাবনার দিকে বইতে শুরু করবে তার জন্য নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকা কৌতূহলী হয়ে থাকবেন। সেই অদ্ভুত জেদ, তেজী মনোবল এবং নিষ্ঠুর সত্যকথা বলার নির্মম সাহস পরবর্তী পর্বে কী আকার ধারণ করল, পাঠক-পাঠিকা এর পরবর্তী খণ্ড থেকে তা জানতে পারবেন।

আমি পূর্বেই বলেছি, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' আশাপূর্ণা দেবীর শ্রেষ্ঠ রচনা, এর পূর্বার্ধ থেকে তা সম্পূর্ণ বোঝা যাবে। সওয়া শতাব্দীর পূর্বেকার গ্রামবাংলার পারিবারিক চিত্র এবং তার সঙ্গে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল এঁকে যাওয়া কঠিন কাজ। লেখিকা সেই কঠিন কাজ আশ্চর্য সরল ও সহজভাবে সমাধা করেছেন। দু-একটি টানে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা, দু-একটি ইঙ্গিতে মনের প্রচ্ছন্ন ছায়াছবির প্রতি পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করা—বিশেষতঃ অন্তঃপুরের এমন সজীব পরিচয় আমরা অতি অল্প উপন্যাসেই পেয়েছি। তিনি পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্রাঙ্কনে অধিকতর দক্ষতা দেখিয়েছেন। এক শ দেড় শ বছর আগেকার অন্তঃপুরচারিণী নারীকুলের চরিত্র অতিশয় বাস্তবনিষ্ঠ ও জীবন্ত হয়েছে। তাদের ছোট ছোট জীবন, অদ্ভুত সংস্কার, আশাহীন আনন্দহীন ব্যর্থ জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি পাঠকের মনকেও বিষণ্ণ করে তোলে। হারিয়ে-যাওয়া অতীত জীবনকে এতটা জীবন্তভাবে একালের প্রকাশ্য সভাস্থলে উপস্থাপিত করা রূপদক্ষ শিল্পীর দ্বারাই সম্ভব। স্ত্রীসমাজের এ-

ছবি বোধ হয় খুব কম লেখকই এ-ভাবে আঁকতে পেরেছেন অবশ্য জেন অস্টেন স্ত্রী-সমাজের ছবি এঁকেছেন সাবলীল ভঙ্গীতে, কিন্তু পুরুষদের পারস্পরিক আলাপাদি ঠিক জীবন্ত করতে পারেননি, কারণ সেকালের ইংলণ্ডে পুরুষ তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে কীভাবে কথা বলত, মেলামেশা করত, তা স্ত্রী-ঔপন্যাসিক জেন অস্টেনের পক্ষে সেকালে জানা সম্ভব ছিল না। আশাপূর্ণা দেবী সে বিষয়ে কোনও খেদ রাখেননি, পুরুষ চরিত্রগুলিকেও যথেষ্ট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন। রোমাঁ রোলাঁর মতো দার্শনিক গভীরতা ও বিভূতিভূষণের মতো প্রকৃতি-তন্ময়তা তিনি দাবি করবেন না, কিন্তু বিস্মৃত ধূসর অতীতকে একটি বালিকা চরিত্রের বিকাশ-স্তরপরম্পরার মধ্য দিয়ে জাগিয়ে তোলা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য।

॥ ৪ ॥

আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে বেশ কয়েকটি ছোট গল্প সঙ্কলিত হয়েছে যার কিছু কিছু পাঠক-পাঠিকারা ইতিপূর্বেই পড়ে থাকবেন। গল্পগুলির অধিকাংশই বড়ো বিষণ্ণ, বড়ো নৈরাশ্যবোধে বেদনাদায়ক। আমাদের পরিচিত পরিবারকে কেন্দ্র করেও তার মধ্যে গভীরতর বিস্ময় ও বেদনার অনুভূতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় লেখিকা অসাধারণ কুশলতা অর্জন করেছেন। ছোট গল্প শুধু বর্ণনাধর্মী গল্পমাত্র নয়, এ হচ্ছে একটা বিশেষ রকমের শিল্পপ্রকরণ বা craft—একটি নাটকীয় মুহূর্ত অকস্মাৎ হাজির হয়ে যখন পাঠকের মনের তারে কাঁপন ধরিয়ে দেয়, অথবা একটি অশরীরী আবেগ যখন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন পাঠক ভাবতে বসে, এ কী হল। সে তো এদিক থেকে ভাবেনি। স্বল্পতম পরিসরের মধ্য দিয়ে গল্পলেখক যতটুকু পরিবেশন করেন, পাঠক তার মধ্য দিয়ে আরও অনেক দূর দেখতে পায়। এ যেন গবাক্ষ দিয়ে বিশ্বদর্শন। ছোট গল্পের মাপাজোখা রীতিপদ্ধতি মুঠোর মধ্যে না এলে অনেক ভালো উপাদানও আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। আশাপূর্ণা দেবী সার্থক ছোট গল্প লিখিয়ে। যতদূর মনে পড়ছে, বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল ছোট গল্প নিয়ে। সে যুগের পূজাবার্ষিক সংখ্যায় তাঁর অনেক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল যার কিছু কিছু এই খণ্ডে সঙ্কলিত দেখে পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

এই সঙ্কলনের কয়েকটি গল্প আমাদের চেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। সরযূ, রাজু, জগদীশ. মমতা—প্রত্যেকটি চরিত্রই নাটকীয় মুহূর্তে পরম বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছে তাদের ব্যর্থতা, অর্থহীনতা, নৈরাশ্য। 'সামান্য ক্ষতি' বড়ো গল্পটি এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে পরিসর একটু বড়ো হলেও বেদনার চিত্রটি অতি গভীর। 'তাসের ঘর' গল্পটি কর্তব্যপরায়ণা নারীর নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গের চিত্রটি অনেকটা ইবসেনের নায়িকার কথা মনে করিয়ে দেয়। ছোট গল্পের সংজ্ঞা নিয়ে বহু বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে, এর ধরণ-ধারণ নিয়ে অনেক পরীক্ষা চলেছে। সাম্প্রতিক গল্প থেকে গল্প বিদায় নিয়েছে। এ যুগের

গল্পে সূক্ষ্মতম আভাস, অশরীরী রহস্য, বাক্যহত বিস্ময় এবং চিত্ততলবর্তী চেতনাপ্রবাহের তরঙ্গকণা নতুন শিল্পরূপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কোথাও গীতকবিতার মূর্চ্ছনা, কোথাও আকস্মিক নাটকীয় চমৎকারিত্ব, কোথাও চরিত্রের অন্তর্লীন প্রায়-অদৃশ্য ইঙ্গিত, কোথাও-বা লেখকের কোন-এক মুহূর্তের impression ছোট গল্পকে অসাধারণ ও অভাবনীয় বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। অবশ্য আশাপূর্ণা দেবীর গল্প ঠিক সাম্প্রতিক গল্পের মতো গল্পহীনতার পরীক্ষা নয়। তাতে যথার্থ গল্পরস আছে, কাহিনীর একটি নিটোল রূপ আছে, একটি বা দুটি চরিত্রের দুঃখ বেদনার গভীর ইঙ্গিত আছে। অবশ্য নিছক গল্প বা যাকে tale বলে, তাও তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁর প্রায় গল্পেই একটা অদৃষ্টপূর্ব নিয়তি ধীরে ধীরে ফাঁস কষে ধরে, সর্বশেষে একটি নাটকীয় মুহূর্তে পাঠক গল্পের পরিণতি স্মরণ করে চমকে ওঠে। এ-বিষয়ে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। উপন্যাসে তিনি বিশাল প্রাঙ্গণকে বেছে নিয়েছেন, ছোট গল্পে একটি কক্ষকে আশ্রয় করেছেন। আকাশ এবং নীড়—দুই প্রান্তেই তাঁর সমান পরিক্রমা।

পাঠকসমাজে তিনি অতিশয় জনপ্রিয়। তাঁরা এইখণ্ডে তাঁদের প্রিয় লেখিকার পুরাতন গল্প ও উপন্যাসকে নতুন করে পড়ার সুযোগ পাবেন।

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়